ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি

×

প্রকাশিত: ১৭:২০, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সাত কলেজ দেশের উচ্চশিক্ষার অন্যতম মেরুদণ্ড। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত। গোটা দেশে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অবদান স্বীকৃত।

কলেজগুলোর স্বকীয়তা রক্ষা করে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার দাবি করছেন শিক্ষকদের একটি অংশ। সম্প্রতি সরকার রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী সাত কলেজকে একত্র করে প্রস্তাবিত 'ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি' অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করেছে। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সাত কলেজকে একত্র করার ধারণাটি নিঃসন্দেহে উচ্চশিক্ষায় আধুনিকতা ও আন্তঃবিষয়ক (ইন্টারডিসিপ্লিনারি) শিক্ষা চালু করার এক মহান প্রয়াস। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নতুন ডিসিপ্লিনের সূচনা, সর্বাধুনিক পাঠ্যক্রম প্রবর্তন, শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ হতে পারে। যুগের চাহিদার নিরিখে, সময়ের প্রয়োজনে ও জীবনের বাস্তবতার আলোকে, দক্ষ মানবসম্পদ উৎপাদনে উচ্চপ্রকাশমান শিক্ষা খুবই প্রয়োজন, যা হাতে নিয়েছে সরকার, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে।

অধ্যাদেশের খসড়ায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠিত হবে। ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ ও কবি নজরুল কলেজের অবকাঠামো স্থায়ীভাবে বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আরও বলা হয়েছে মোট ক্লাসের ৪০ শতাংশ অনলাইনে, বাকিগুলো হবে সশরীরে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি ইন্টারডিসিপ্লিনারি শিক্ষা পদ্ধতির হওয়ায়, স্নাতক পর্যায়ে প্রথম চার সেমিস্টারে 'সাধারণ বিষয়গুলো' অধ্যয়ন করে, পরবর্তী চার সেমিস্টার হবে 'ডিসিপ্লিনভিত্তিক'। স্নাতক পর্যায়ের কোনো শিক্ষার্থীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রথম চারটি সেমিস্টার শেষে শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিজ ক্যাম্পাসে ডিসিপ্লিন পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক কেন্দ্র, অডিটোরিয়াম, স্বাস্থ্যকেন্দ্র একটি স্বতন্ত্র স্থান থেকে পরিচালিত হবে। সাত কলেজ শুধু শিক্ষা বিস্তার নয়, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রেখেছে। কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন, অধ্যাদেশ অনুযায়ী সাত কলেজের নিজস্ব পরিচয় ও কাঠামো ভেঙে ফেললে শিক্ষার বহুমাত্রিক ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষা হলো দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় বিনিয়োগ, যেখানে কোনো ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত কাম্য নয়। বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সরকারি উদ্যোগ যে কোনো সময় প্রশংসনীয় হতে পারে যদি তা বাস্তবসম্মত হয়। আমরা সকল পক্ষের সরাসরি সম্পৃক্তির মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু সমাধান চাই, যেন আমাদের আগামী প্রজন্ম সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণের হাতেখড়ি এখান থেকেই পায়।